আফগানিস্তানে মার্কিন পরাজয় ও তালেবানের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন

[আফগানিস্তানে কুড়ি বছর ধরে যুদ্ধ করে তালেবান ক্ষমতায় ফিরেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থিত সরকার তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের তড়িঘড়ি করে দেশত্যাগ করতে হয়েছে। আগস্ট মাসের এই ঘটনাপ্রবাহের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটের সূচনা হয় ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র-তালেবানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। ৩ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত এই বিষয়ে প্রথম আলো'তে প্রকাশিত চারটি নিবন্ধ এখানে একত্রে উপস্থাপিত হল।]

এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়ের দলিল

যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবানের মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি আফগানিস্তানে ১৮ বছর ধরে থাকা মার্কিন সেনাদের উপস্থিতির অবসানের প্রক্রিয়ার সূচনা করল। গত শনিবার [২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০] দোহায় দুই পক্ষের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র আগামী ১৩৫ দিনের মধ্যে তার সৈন্যসংখ্যা এখনকার ১৩ হাজার থেকে ৮ হাজার ৬০০-তে নামিয়ে আনবে এবং ১৪ মাসের মধ্যে সব সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। এই প্রত্যাহারের অঙ্গীকার শর্তমুক্ত নয়; চুক্তির বাস্তবায়ন নির্ভর করছে আগামী দিনগুলোতে তালেবানের আচরণ, আফগানিস্তানে সহিংসতার মাত্রা হ্রাস এবং তালেবান ও আফগান সরকারের মধ্যে সফল আলোচনার ওপরে।

এই চুক্তির জন্য দুই পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে কয়েক বছর ধরে, তাতে কখনো অগ্রগতি হয়েছে, কখনো মনে হয়েছে আলোচনা নিষ্ফল হতে চলেছে। এখন এই চুক্তির কৃতিত্ব প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করবেন এই বলে যে, ২০১৬ সালের নির্বাচনে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধের অবসান করবেন, সৈন্যদের ফেরত আনবেন, তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। নির্বাচনের বছরে তাঁর এই দাবি তাঁর সমর্থকদের কাছে খানিকটা হলেও গুরুত্ব বহন করবে, কিন্তু তাঁরা এই ইতিহাস জানতে চাইবেন না যে এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল ট্রাম্পের পূর্বসূরি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমলেই। যুদ্ধাবসানের ও সৈন্য প্রত্যাহারের আলোচনার সূত্রপাত যিনিই করুন না কেন, আর যাঁর আমলেই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এই দীর্ঘতম যুদ্ধের অবসান হোক না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়ের দলিল।

২০০১ সালে টুইন টাওয়ারে আল-কায়েদার সন্ত্রাসী হামলার পর আল-কায়েদা ও তার নেতা ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয়দাতা আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত করতে যুক্তরাষ্ট্র যে যুদ্ধের সূচনা করেছিল, এখন তা থেকে পরাজিত যুক্তরাষ্ট্র পশ্চাদপসরণ করল। ইতিমধ্যে পৃথিবীতে অনেক বদল হয়েছে, এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পড়েছে সারা বিশ্বে। এই যুদ্ধ সামনে রেখে যে তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধের' বা গ্লোবাল ওয়ার অন টেররের সূচনা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা, তার ভয়াবহ পরিণতির ভার বইছে সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ—দেশে দেশে নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত হয়েছে, লাভবান হয়েছে ক্ষমতাসীনেরা, বিশেষ করে স্বৈরাচারী শাসকেরা, আর্থিক লাভ গুনেছেন যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা; অন্য পক্ষে দেশে দেশে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো তাদের ডালপালা বিস্তার করার পক্ষে যুক্তি হাজির করেছে, সফল হয়েছে।

আফগানিস্তানে মার্কিনদের উপস্থিতি এবং অন্তহীন যুদ্ধের আলোচনায় যে কথাগুলো বারবার উঠেছে, শনিবার চুক্তি সম্পাদনের পর আবারও তা বলা হচ্ছে—ক্ষতির পরিমাণ কত? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২ হাজার ৩০০ সৈন্য নিহত হয়েছেন, আহতের সংখ্যা প্রায় ২১ হাজার। মানসিকভাবে অসুস্থতার শিকার হয়েছেন কত, তার হিসাব নেই। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের করা এক হিসাবে ২০০১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর ৫৮ হাজার সদস্য নিহত হয়েছেন। অর্থের হিসাব করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। আর আফগান নাগরিকদের কত জন মারা গেছেন, তার কোনো নির্ভরযোগ্য হিসাব নেই—জাতিসংঘ ২০০৯ সাল থেকে যে হিসাব রাখতে শুরু করেছে, তাতে দেখা যায় কমপক্ষে ৩৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, ৬৫ হাজার আহত; হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দেওয়া হিসাবে ২০১৬ থেকে প্রতিবছর যে ১১ হাজার নাগরিক মারা গেছে, তার কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে শিশু। কিন্তু এসব হিসাব যে পূর্ণ হিসাব নয়, তা সহজেই বোধগম্য। নিহতের সংখ্যা লাখের ওপরে বলেই অনেকের অনুমান।

এত প্রাণ, রক্ত, অর্থ, অবকাঠামোগত ধ্বংসের শেষে কি আফগানিস্তানে শান্তির আলো দেখা যাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে এ কথা মনে রাখতেই হবে যে দেশটি হত্যাকাণ্ডের এই লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে ১৯৭৯ সাল থেকেই। ১৯৭৯-৮৯ সময়ে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আফগানদের প্রতিরোধের সময়, ১৯৮৮ সালের ১ মে পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারি হিসাবে তার ১৩ হাজার ৩১০ জন সৈন্য নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল ৩৫ হাজার ৪৪৮ জন, নিখোঁজ ৩১১ জন। ১৯৮৮ সালের ১ মে জেনারেল আলেক্সি লিজিচেভের এই হিসাব ছিল সরকারিভাবে দেওয়া একমাত্র তথ্য (নিউইয়র্ক টাইমস, ২৬ মে ১৯৮৮)। আর বেসামরিক ব্যক্তিদের নিহত হওয়ার একটা হিসাব প্রথম করার চেষ্টা করেন মারেক সিলউস্কি, ১৯৮৮ সালে পাকিস্তানে আফগান শরণার্থীদের ওপরে চালানো এক জরিপের মাধ্যমে। তার ভিত্তিতে তিনি বলেছিলেন, মোট নিহতের সংখ্যা আফগান জনসংখ্যার ৯ শতাংশ; ১০ থেকে ১৫ লাখ; এর ৮০ শতাংশ ছিল বেসামরিক নাগরিক। নূর আহমদ খালিদি এই বিষয়ে আরও গবেষণা করে দেখান মোট নিহতের সংখ্যা ৮ লাখ ৭৬ হাজার ৮২৫ জন (দেখুন—'আফগানিস্তান: ডেমোগ্রাফিক কন্সিকিউয়েন্সস অব ওয়ার ১৯৭৮-১৯৮৭ ', *সেন্ট্রাল এশিয়া সার্ভে*, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩,১৯৯১)।

এই পরিসংখ্যান দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা নয় যে বাইরের শক্তিগুলোর মধ্যে কে বেশি বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে; বরং স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে আফগানিস্তানের নাগরিকেরা কত দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধের ভিকটিম হয়েছেন। এই হিসাবে ১৯৮৯ সালের পরে মুজাহিদ ও তালেবানের মধ্যে সংঘাতে কত মানুষ মারা গেছে, তার হিসাব নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, চার দশক ধরে আফগানিস্তান যে প্রাণঘাতী যুদ্ধের মধ্যে আছে, এই চুক্তি কি তার অবসানের পথ সুগম করবে?

বৃহৎ শক্তির ভূ-রাজনীতির সংঘাতের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আফগানিস্তান—তার সূচনা ১৯৭৯ সালে নয়, ২০০১ সালেও নয়। কিন্তু আফগান ইতিহাস বলে যে ব্রিটিশ, সোভিয়েত বা মার্কিন কোনো বহিঃশক্তি আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, আফগান জনগণ দীর্ঘ মেয়াদে বাইরের শক্তিকে মেনেও নেয়নি। কিন্তু এর পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে আফগানিস্তানে রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে; কেননা, আফগানিস্তানের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অধীনস্থ হতে চায়নি। আফগান অভ্যন্তরীণ সংঘাতের এটি একটি বড় উপাদান।

আফগানিস্তানে কাবুলকেন্দ্রিক ক্ষমতাশালী কেন্দ্রভিত্তিক (সেন্ট্রালাইজড) রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টায় কেবল আমির আবদুর রহমান (১৮৮০-১৯০১) ব্যর্থ হননি, কমিউনিস্টরা ব্যর্থ হয়েছে (১৯৭৪-১৯৮৯), তালেবান ব্যর্থ হয়েছে (১৯৯৬-২০০১) এবং ২০০১ সালের পরে সব সরকার ব্যর্থ হয়েছে। আফগানিস্তানের এখনকার সংবিধান সেই ধরনের রাষ্ট্র গঠনের দলিল, প্রেসিডেন্টের হাতে অভাবনীয় ক্ষমতা তার প্রমাণ। সেই কারণেই ভবিষ্যতে আফগানিস্তানে শান্তি আসবে কি না, তার একটা বড় দিক হচ্ছে আফগান সরকার ও তালেবানের মধ্যকার আলোচনার সাফল্য, দেশের রাজনীতির ও সংবিধানের বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া না-হওয়া। চুক্তিতে এই বিষয়ে বলা হয়েছে, এই আলোচনার ওপরে মার্কিনদের সৈন্য প্রত্যাহার নির্ভর করছে।

আফগানিস্তানের এই চুক্তির পরে, বিশেষ করে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের পরে, আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ভূমিকা কী হবে, তার ওপরে নির্ভর করছে সুড়ঙ্গের শেষে আলো আছে কি না। তালেবানের সঙ্গে পাকিস্তানের সখ্য সর্বজনবিদিত। গত ১৯ বছর পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও আশ্রয় না পেলে তালেবানের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হতো। এখন তালেবান যখন আফগান রাজনীতিতে ভূমিকা রাখবে, তখন এত দিনের এই ঋণের বিনিময়ে তারা কী দেবে, সেটাই প্রশ্ন। পাকিস্তান সব সময় মনে করে এসেছে যে আফগানিস্তানকে তার প্রভাববলয়ের মধ্যে রাখতেই হবে তার নিরাপত্তার জন্য এবং মধ্য এশিয়ায় তার যাওয়ার পথ হিসেবে। অন্যপক্ষে ভারতের যে প্রভাব এখন আফগান সরকারের ওপর আছে, তা হ্রাস পাওয়ার যেকোনো সম্ভাবনাকে ভারত কীভাবে মোকাবিলা করবে? এই প্রশ্নগুলো নতুন নয়, যখন থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের কথা উঠেছে, সেই থেকেই হচ্ছে। কিন্তু এসবের উত্তর এখনো স্পষ্ট নয়। সৌদি আরব কী ভূমিকা নেবে? ইরানের সঙ্গে তালেবানের সম্পর্ক অতীতে বিভিন্ন ধরনের সমীকরণের মধ্য দিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে কী হবে, তা অস্পষ্ট।

এই চুক্তিতে তালেবান অঙ্গীকার করেছে যে তারা আল-কায়েদা বা আইএসের মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সমর্থন ও আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবে না। কিন্তু চুক্তির পরে তারা বলেছে এটা একেবারে এতটা স্পষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্র এটা আদায় করতে পেরে খুশি। কিন্তু এই অঙ্গীকার কি যথেষ্ট? চুক্তির একটা বড় দিক হচ্ছে, এতে আফগান নারীদের অধিকার রক্ষার কোনো অঙ্গীকার নেই। তালেবান শাসনে নারীদের বিরুদ্ধে যে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা জারি হয়েছিল, ভবিষ্যতে তার চেষ্টা হবে না, সেই অঙ্গীকার নেই। আফগান সরকারপক্ষ যখন আলোচনায় বসবে, তখন তারা তালেবানের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার আদায় করতে পারবে কি?
যেকোনো চুক্তির পরেই বলা হয়, আমরাও জানি যে এটি কেবল সূচনা। অনেক প্রতিবন্ধকতা সামনে। সেগুলো পার হয়ে আফগান নাগরিকেরা শান্তি ও অধিকার দুই-ই পাবে, সেটা এখন কেবল আমরা প্রত্যাশাই করতে পারি।
[২ মার্চ ২০২০]

ভূরাজনীতির গোলকধাঁধায় আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় তালেবানের প্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী ধরে নিয়েই এখন সব ধরনের আলোচনা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোর সৈন্য প্রত্যাহারের পর কাবুলে ক্ষমতাসীন সরকার আর কত দিন টিকে থাকতে পারবে, তা নিয়ে প্রায় সবাই-ই সংশয় প্রকাশ করছেন। সবার স্মরণে আছে যে ১৯৮৯ সালে তৎকালীন

সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যরা আফগানিস্তান ত্যাগের পর তাদের সমর্থিত নাজিবুল্লাহ সরকার টিকে ছিল ১৯৯২ সাল পর্যন্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে দ্বিগুণ সময় মার্কিন ও আন্তর্জাতিক বাহিনীর উপস্থিতি এবং তার চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় ও প্রাণনাশের পরও এটাই বাস্তব যে আফগানিস্তানে এমন কোনো রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে ওঠেনি, যা তালেবানদের আদর্শ ও সামরিক অভিযান মোকাবিলা করতে পারে।

কেন আফগানিস্তানে এমন রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি, যেখানে তালেবানের বিকল্প শক্তি তৈরি হয়, কেন তালেবানের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকল, সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। গত এক দশকে বিশ্লেষকেরা বিভিন্নভাবেই এটা বলেছেন যে আফগানিস্তানে যে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, শাসনকাঠামো যেভাবে দুর্নীতিকে আশ্রয় দিয়েছে, অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টায় যে ব্যর্থতা থেকে গেছে এবং বিদেশি প্রভাব যেভাবে দৃশ্যমান থেকেছে, তাতে করে তালেবানকে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। আফগান সমাজে তালেবানের সমর্থক আছে, তাদের রাজনৈতিকভাবে অঙ্গীভূত না করে সামরিকভাবে মোকাবিলা করতে গিয়ে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে এই সময়ে আফগানিস্তানের সমাজে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনও ঘটেছে, যেগুলো তালেবান ক্ষমতায় থাকার সময়ে অকল্পনীয় ছিল। এ রকম প্রেক্ষাপটেই তালেবানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তাতে অগ্রগতি হয়েছে সামান্যই।

তালেবানের প্রত্যাবর্তনের যে হিসাব-নিকাশ হচ্ছে, তাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ভূরাজনীতির প্রশ্ন। আফগানিস্তানের ইতিহাস বলে যে দেশটি হাজার হাজার বছর ধরেই বড় শক্তিগুলোর ভূরাজনীতির খেলার ময়দান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পারস্য সাম্রাজ্যের আক্রমণ, আলেকজান্ডারের অভিযান, চেঙ্গিস খানের হামলা, ব্রিটিশদের যুদ্ধ, সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন, মার্কিনদের উপস্থিতির পেছনে থেকেছে ভূরাজনৈতিক বিবেচনা। বিংশ শতাব্দীতে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আঞ্চলিক শক্তি পাকিস্তান ও ভারত; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই দুই দেশ আফগানিস্তানে প্রভাব রেখেছে। তুরস্ক ও ইরানও তাদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার প্রবেশদ্বারে থাকা দেশটি দখল বা অন্তত পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে সবাই। ভূগোলের অভিশাপ বইতে হয়েছে আফগানিস্তানের জনগণকে। তারা প্রতিটি চেষ্টাকেই নস্যাৎ করেছে, কিন্তু এর জন্য তাদের গুনতে হয়েছে বড় রকমের মাশুল।

এখনো যখন আলোচনার কেন্দ্রে এই ভূরাজনীতির বিবেচনাই প্রাধান্য পাচ্ছে, তখন মনে রাখা দরকার যে এই খেলার ক্রীড়নক ও কুশীলবেরা ভিন্ন হলেও এর পরিণতি ভিন্ন হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। এখনকার প্রধান কুশীলব হচ্ছে পাকিস্তান, ভারত, চীন ও রাশিয়া। ২০০১ সালের পর থেকে কাবুলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সখ্যের কারণে এবং যেহেতু তালেবান পাকিস্তানের মদদপুষ্ট, সেহেতু সবার প্রশ্ন হচ্ছে, তালেবান ক্ষমতায় এলে ভারত কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ভবিষ্যতে পাকিস্তানের ভূমিকা কী হবে। চীনের সঙ্গে তালেবানের যোগাযোগ ২০১৮ সাল থেকেই, কিন্তু সম্প্রতি তালেবান প্রতিনিধি মোল্লা বারাদার আখুন্দের সঙ্গে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর বৈঠকের কারণে গণমাধ্যমে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চীন আফগানিস্তানে কী চায় এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এর কী প্রতিক্রিয়া হবে।

এসব প্রশ্নের উত্তর একার্থে খুব জটিল নয়। পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে তালেবানকে আশ্রয় দিয়েছে আফগানিস্তানে তাদের পছন্দের সরকার নিশ্চিত করতে, ভারতের প্রভাব হ্রাস এবং মধ্য এশিয়ায় প্রবেশের পথ করতে। ভারতের ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য একই; তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তালেবানের সঙ্গে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে দেশটির উদ্বেগ।

তালেবান নেতাদের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ ও বৈঠকে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের একটি প্রধান প্রভাবশালী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হওয়া এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা

দেশগুলোর নেতৃত্বে যে উদার বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তার বিকল্প হাজির করা। সেই লক্ষ্যেই ২০১৩ সালে বেল্ট অ্যান্ড রোড (বিআরআই) প্রকল্পের সূচনা। আফগানিস্তান সেই অর্থে ভিন্ন কিছু নয়। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চাদপসরণ চীনকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ হিসেবে চীনের কাছে আফগানিস্তানের আরও দুটি গুরুত্ব আছে।

প্রথমত, নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট। ১৯৮২ সালের নভেম্বরে তৎকালীন চীনা নেতা দেং শিয়াও পিং বলেছিলেন, 'আফগানিস্তানের সমস্যার বৈশ্বিক কৌশলগত গুরুত্ব আছে। চীন ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্ত আছে, এটা ভৌগোলিকভাবে চীনকে ঘিরে ফেলার কাজে ব্যবহার হতে পারে।' চীনের এখনকার নেতারা এটা ভুলে যাননি। এখন বরং উইঘুরের মুসলিমদের ওপর নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে চীন উদ্বিগ্ন যে তার জিয়াংজিং প্রদেশে সহিংস উগ্রবাদ বিস্তার লাভ করে কি না। এ জন্য চীন ইস্ট তুর্কেস্তান ইসলামিক মুভমেন্টকে (ইটিআইএম) দায়ী করে। তারা চায়, আফগানিস্তানের সরকার ইটিআইএমকে আশ্রয়-প্রশ্রয় যেন না দেয়। সেটা নিশ্চিত করতেই তালেবানের ওপর নির্ভর করছে চীন। শুধু ইটিআইএম নয়, চীন আফগানিস্তানে আল-কায়েদা বা আইসিসের উপস্থিতির আশঙ্কাও করে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক। গত কয়েক বছরে চীন আফগানিস্তানে যা বিনিয়োগ করেছে, তা সুরক্ষা করতে চায়। এই দুই কারণে চীনের দরকার স্থিতিশীল আফগানিস্তান, সেখানে কে ক্ষমতায় থাকল, তা তার বিবেচ্য নয়।

স্থিতিশীলতা এবং কোনোভাবে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হওয়ার বিবেচনা কেবল চীনের নয়, একই চিন্তা ইরানেরও। ফলে তালেবানের ব্যাপারে ইরানের দৃষ্টিভঙ্গিও আর আগের মতো নেই। ইরান এতেই আনন্দিত যে তার দোরগোড়ায় যুক্তরাষ্ট্র উপস্থিত থাকছে না। চীন তালেবান সামলালে তাতে ইরানের লাভ। রাশিয়া সরকারিভাবে তালেবানকে সন্ত্রাসী সংগঠন বললেও জুলাইয়ে তাদের প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেছে এবং আশা করছে যে তালেবানের সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে মধ্য এশিয়ায় বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোতে সন্ত্রাসী সংগঠনের বিস্তার বন্ধ করা যাবে।

বিশ্লেষক ও বিভিন্ন দেশের নীতিনির্ধারকেরা আশা করছেন, গত ২০ বছরে তালেবান নেতৃত্বের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন ঘটেছে। সেই পরিবর্তনের কী লক্ষণ দেখা গেছে, তা স্পষ্ট নয়। একইভাবে ক্ষমতায় থাকার সময় তালেবান যে নিপীড়নমূলক শাসন চালিয়েছে, ভবিষ্যতে তা থেকে সরে আসবে, এমন কোনো প্রতিশ্রুতি তালেবান দেয়নি। যেসব এলাকায় তালেবান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানে তাদের আচরণ এমন কোনো পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত দেয় না। ফলে তালেবানের ক্ষমতায় আসীন হওয়া নিয়ে উদ্বেগ যথাযথ।

কাবুলে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে তালেবানের অন্যতম অভিযোগ হচ্ছে, এই সরকার আফগানিস্তানের জনগণের এক বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রশ্ন হচ্ছে, তালেবান যদি ক্ষমতায় যায়, তারা আফগানিস্তানের বহুত্ববাদিতাকে, ভিন্নমতকে সম্মান করবে কি না। নাগরিকদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার, নারীদের সমানাধিকার, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষার বিস্তারসহ বিভিন্ন বিষয়ে গত দুই দশকে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে; সেগুলোকে তালেবান ধ্বংস করে দেবে না, এর নিশ্চয়তা কোথায়? মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার গ্যারান্টি তালেবানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, এমন নয়।

দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, ভূরাজনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ বিবেচনা করে চীন, রাশিয়া, ইরান তালেবানের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলছে; কিন্তু আফগান নাগরিকদের ভাগ্যে কী ঘটবে, তা নিয়ে কেউই তালেবানকে প্রশ্ন করছে না। আফগান সমাজে তালেবানের আদর্শের বাইরে নাগরিকেরা আছে, বিশেষ করে গত দুই দশকে পরিবর্তনের কারণে যে জনগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটেছে, তাদের বাদ দিয়ে অংশগ্রহণমূলক শাসন গড়ে তোলা যাবে

না। তালেবান এককভাবে বা অন্যদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ক্ষমতায় গেলে, সেটা করতে রাজি আছে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।
[৪ আগস্ট ২০২১]

আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় যেভাবে অনিবার্য হয়ে উঠল

অভাবনীয় দ্রুততার সঙ্গে আফগানিস্তানের অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। রোববার দেশের অন্যতম প্রধান শহর জালালাবাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তালেবান। কাবুল ছাড়া সব বড় শহর এখন তালেবানের দখলে। কাবুলের পতন এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র। মাত্র কয়েক সপ্তাহে তালেবানের এ সাফল্যে তালেবানের প্রতি সহানুভূতিশীলরা ছাড়া সবাই বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। ভবিষ্যতে কী হবে, তা নিয়ে শঙ্কা আছে। দুই দশক অবস্থানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করছে, দূতাবাসের কূটনীতিক ও কর্মচারীদের সরিয়ে নিতে নতুন করে সেনা পাঠানো হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট হচ্ছে মার্কিন সৈন্যদের প্রত্যাহার। কিন্তু কেন যুক্তরাষ্ট্র এ সিদ্ধান্ত নিল, এ পরাজয়ের প্রেক্ষাপট কী, সেটা না বুঝলে আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে না।

প্রত্যাহার: বাইডেনের আর কী বিকল্প ছিল

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত ২১ এপ্রিল ঘোষণা করেন, আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই মার্কিন সৈন্যরা আফগানিস্তান ত্যাগ করবে। সেই থেকেই প্রশ্ন ওঠে, বাইডেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিলেন কি না। যাঁরা মনে করেন, এ সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি বয়ে আনবে, কৌশলের বিবেচনায় এভাবে ঘোষণা দেওয়া ঠিক হয়নি, তাঁরা এবং বিস্ময়কর হলেও লক্ষণীয়, যাঁরা দুই দশক ধরে আফগানিস্তানে মার্কিন ও বিদেশি সৈন্যদের উপস্থিতির প্রবল সমালোচনা করে আসছিলেন, তাঁদের একাংশও এখন ক্ষমতায় তালেবানের সম্ভাব্য অধিষ্ঠানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকেই দায়ী করছে। যুক্তরাষ্ট্র কেন আফগানিস্তানের মানুষকে রেখে 'পালিয়ে' যাচ্ছে, সেটাই তাঁদের প্রশ্ন—একে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলেই বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা স্বীকার না করলেও এটাই প্রমাণিত হচ্ছে, মার্কিন উপস্থিতির কারণেই তালেবানের বিজয় বিলম্বিত হয়েছে। এভাবে তালেবানের বিজয় বিলম্বিত হওয়ায় লাভ হয়েছে কি না, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। দেশের ভেতরে গড়ে ওঠা একটি শক্তিকে কেবল বল প্রয়োগ করে মোকাবিলা করা ও ক্ষমতার বাইরে রাখা একটি বিদেশি বাহিনীর দায়িত্ব হতে পারে না। ফলে, তালেবানের উত্থানের পরিণতির দায় কেবল মার্কিনদের প্রত্যাহারের ওপরে চাপানো সঠিক নয়।

এটাও মনে রাখতে হবে, সৈন্য প্রত্যাহারের এ চুক্তি প্রেসিডেন্ট বাইডেন করেননি, তা সম্পাদিত হয়েছিল তাঁর পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে। কয়েক বছরের আলোচনার অগ্রগতি এবং অচলাবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিশ্বে তাঁর কথিত শান্তিবাদী ইমেজ তুলে ধরতে এবং দেশের ভেতরে তাঁর সমর্থকদের কাছে এটা প্রমাণ করতে যে তিনি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করেন, যার ফলে তাড়াহুড়ো করেই ২০২০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দোহায় তালেবানের সঙ্গে চুক্তি করেন। সেখানে বলা হয়েছিল, ১৪ মাসের মধ্যে সব সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে। (আলী রীয়াজ, 'এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়ের দলিল', প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০২১; আলতাফ পারভেজ, 'যে যুদ্ধের শুরু সহজ ছিল, গুটিয়ে আনা কঠিন', প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০২১)। বাইডেন এ চুক্তি বাস্তবায়ন না করলে তিনি এই বলে সমালোচিত হতেন, তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে চান। সৈন্য প্রত্যাহারের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য যাঁরা বাইডেনকে দায়ী করছেন, তাঁদের একাংশ যে চুক্তি না মানার জন্যই তাঁকে অভিযুক্ত করত, সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

তারপরও গত এক দশকের ইতিহাস বলে, এ যুদ্ধে মার্কিনদের বিজয়ের কোনো সম্ভাবনাই নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে তালেবানের অগ্রগতি ইঙ্গিত দিচ্ছিল, তাদের অগ্রগতির প্রতি আফগান জনগণের একাংশের সমর্থন অত্যন্ত দৃঢ়। সেই সমর্থন কাবুলে ক্ষমতাসীন হামিদ কারজাই, আশরাফ গনি বা আবদুল্লাহরা দুর্বল করতে সক্ষম হচ্ছেন

না। একটি অংশগ্রহণমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তালেবান–সমর্থকদের বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরা একার্থে অনেক আগে সেটা উপলব্ধি করেই তালেবানের সঙ্গে আলোচনার সূচনা করেন। কিন্তু সেই আলোচনার সাফল্যের বিষয়ে যখন কোনো আশা নেই, সে সময়ে বাইডেন আর ভিন্ন কী করতে পারতেন? এটাও বাইডেন প্রশাসনের বিবেচনার বিষয় ছিল, সৈন্য প্রত্যাহার করার কারণে যা দাঁড়াবে, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তা কাঙ্ক্ষিত নয়। এতে গোটা শাসনব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটবে, সেটাও তাদের বিবেচনায় আছে বলেই ধারণা করা যায়। কিন্তু মাঠপর্যায়ে তাদের অবস্থা এবং রাজনৈতিক চালচিত্র তাদের অনুকূলে ছিল না। ভবিষ্যতে সেখানে অবস্থান করলেও ভিন্ন কোনো ফল হতো না।

যুক্তরাষ্ট্র কী পেল, কীভাবে ব্যর্থ হলো

আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরাজিত হয়েছে, ন্যাটোর শরিকেরা পরাজিত হয়েছে—এ নিয়ে কোনো রকমের ভিন্নমতের অবকাশ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরা কূটনৈতিক ভাষায় একে যেভাবেই ব্যাখ্যা দিন না কেন, তাঁরা জানেন, পরাজয়ের চেহারা এ রকমই হয়। তারপরও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তি এইটুকু, আল-কায়েদার শক্তি ও অবস্থান দুর্বল হয়েছে; এখন একটি সুসংগঠিত আল-কায়েদা নেই। বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত আল–কায়েদার অনুসারী আল-শাবাব সোমালিয়ায় এখন ক্রমবর্ধমান, মালিতে আইসিসের অনুসারীরা শক্তি সঞ্চয় করছে, দক্ষিণ এশিয়ায় আল-কায়েদা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। মধ্যপ্রাচ্যে ও এশিয়ায় এ ধরনের উগ্র সহিংস সংগঠন আছে। কিন্তু এসব গোষ্ঠীর লক্ষ্য এখন সীমিত—আফগানিস্তানে গত ২০ বছর যদি তালেবানের শাসন থাকত, তবে পরিস্থিতি যে ভিন্ন হতো, সেটা নিশ্চিত।

গত দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের ওপরে বাইরে থেকে যে সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হয়নি, সেটাকেই যুক্তরাষ্ট্র সাফল্য বলে দাবি করতে পারে। এর চেয়ে বেশি কিছু দাবি করা যাবে না। তার জন্য যে ব্যয় হয়েছে—অর্থ ও জীবনের হিসাবে—সেটা কি আনুপাতিক? অবশ্যই তা আনুপাতিক নয়।

যুক্তরাষ্ট্র যে আফগানিস্তানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের কিংবা বিংশ শতাব্দীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয় থেকে শিক্ষা নেয়নি, সেটিই কেবল তাদের ব্যর্থতা নয়; এমনকি তারা যে ভিয়েতনাম তাদের নিজেদের পরাজয় থেকেও শিক্ষা নেয়নি, সেটাই লক্ষণীয়। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল মোকাবিলায়, কাউন্টার-ইন্সারজেন্সির কৌশলে বড় ধরনের ভুল হয়েছে, সেটা নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্ন উঠছে, ৮৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যে আফগান সেনাবাহিনী তৈরি ও প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল, তারা কীভাবে এত সহজেই ভেঙে পড়েছে। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে আফগান সেনাবাহিনীর মনোবলের অভাব। অথচ বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এ বিষয়ে যেসব তথ্য দিয়েছে, সেগুলো ছিল অতিরঞ্জন, অসম্পূর্ণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা। দুর্নীতি এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে তালেবানের যোগাযোগের বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড় ব্যর্থতা হচ্ছে আফগানিস্তানের এলিটদের দুর্বলতাগুলো মোকাবিলা করতে না পারা। আফগানিস্তানের এলিটদের এক বড় অংশ, বিশেষ করে যাঁরা গত দুই দশক ক্ষমতায় ও ক্ষমতার কাছাকাছি থেকেছেন, তাঁরা অত্যন্ত সংকীর্ণ বা প্যারোকিয়াল, বহুধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত এবং দুর্নীতিপরায়ণ। এসব বৈশিষ্ট্য আফগান জনগণের এক বড় অংশের কাছে ক্ষমতাসীনদের অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। এলিটদের এ চরিত্র সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি সমর্থন দিয়েছে, এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই অভিযুক্ত হতে পারে। মার্কিন নাগরিকেরা এটা বলতেই পারেন, তাঁদের করের অর্থের এ অপচয় তাঁরা সঠিক মনে করেন না। কিন্তু তাঁর পরিণামের দায় এই এলিটদেরও। তাঁরা সম্ভবত ধরে নিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলো অব্যাহতভাবে তাঁদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যেতে বাধ্য, ইতিমধ্যে আঞ্চলিক শক্তি ভারত ও চীনের বিনিয়োগ থেকে অর্থনীতির অনুকূল অবস্থা তাঁদের একধরনের আত্মসন্তুষ্টি তৈরি করেছিল। অন্যদিকে, কাবুলের সরকার কূটনীতির খেলায় ক্রমান্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতনির্ভর হয়ে পড়েছে।

কিছুই কি অর্জিত হয়নি

গত দুই দশকে মার্কিন উপস্থিতি এবং তার সমর্থিত সরকারের সময় যে যুদ্ধ চলেছে, তাতে মানুষের প্রাণহানির অসম্পূর্ণ হিসাব আমরা জানি। ওয়াটসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, ব্রাউন ইউনিভার্সিটির সূত্রের বরাত দিয়ে বিবিসির এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, আফগানিস্তানে ২০০১–২১ সাল পর্যন্ত যুদ্ধে মার্কিন ও মিত্রবাহিনীর ৩ হাজার ৫৮৬ জন নিহত হয়েছেন। পুলিশ ও সেনাসদস্যের মৃত্যু হয়েছে ৭৫ হাজার ৯৭১ জনের, বেসামরিক মানুষ নিহত হন ৭৮ হাজার ৩১৪ জন, আর তালেবানসহ সরকারবিরোধী যোদ্ধা নিহত হওয়ার সংখ্যা ৮৪ হাজার ১৯১ (প্রথম আলো, ১৪ আগস্ট ২০২১)। এত প্রাণহানি সত্ত্বেও আফগান সমাজে কি কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি?

সমাজে নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের কথা বহুল আলোচিত; গত এক দশকে শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ ১৫ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশ হয়েছে। গত দুই দশকে গড় আয়ু ৫৬ বছর থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫ বছরে; শিশু মৃত্যুর হার ২০০১ সালে ছিল হাজারে ১২০ জনের বেশি, ২০২০ সালে তা দাঁড়িয়েছে অর্ধেকে। ১৯৯৬ সালে তালেবান ক্ষমতা দখলের সময় প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে অংশগ্রহণের হার ছিল ৪২ শতাংশ, ২০০১ সালে তা দাঁড়ায় ২০ শতাংশ; ২০১০ সালে দাঁড়ায় ১০০ শতাংশ। নাগরিকদের অধিকার বা অন্যান্য বিবেচনা যুক্ত করলে গত দুই দশকে আফগান সমাজে এক বড় ধরনের পরিবর্তন দেখাতে পাওয়া যায়। এগুলো আফগান জনগণের জীবনে প্রভাব ফেলেনি, এমন নিশ্চয় বলা যাবে না। সামনের দিনে কী ঘটবে, তার হিসাবে—এ বিষয়গুলো বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই।

দুই দশকের শিক্ষা কী

আফগানিস্তানে মার্কিনদের পরাজয় এবং সৈন্য প্রত্যাহার থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে লক্ষ্যহীন যুদ্ধে কোনো শক্তি বিজয়ী হয় না। ২০০৩ সালের পর থেকে আফগানিস্তানে মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনীর উপস্থিতি এবং যুদ্ধের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। আল-কায়েদাকে আফগানিস্তান থেকে কার্যত তিরোহিত করার পরে যে ভূমিকায় যুক্তরাষ্ট্র অবতীর্ণ হয়েছিল, তা বিদেশি শক্তির ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মাধ্যমে অর্জন সম্ভব নয়।

২০০৫ সালের পর থেকে কাবুলে একটি সরকার টিকিয়ে রাখার পক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা হলো দেশে স্থিতিশীলতা রক্ষা, নিরাপত্তা বজায় রাখা। কিন্তু এ লক্ষ্যে দেশের ভেতরে থেকে যদি রাজনৈতিক শক্তি গড়ে না ওঠে এবং এ লক্ষ্যে একধরনের জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে এর দুটির কোনোটাই অর্জন করা যায় না। বিশেষ করে যেখানে প্রতিবেশী কোনো দেশ এ ধরনের চেষ্টার বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকে। আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার প্রধান বাধা ছিল পাকিস্তান। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতির জন্য পাকিস্তানের ওপরে নির্ভর করতে হয়েছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তালেবানকে আশ্রয় দিয়েছে, সমর্থন করেছে; পাকিস্তানি সমাজের এক বড় অংশ আদর্শিক বিবেচনায় এবং মার্কিন বিরোধিতার নামে তালেবানের পক্ষেই থেকেছে।

দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে, বহিঃশক্তি রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি ও জাপানে যা সম্ভব হয়েছে, একবিংশ শতাব্দীতে আফগানিস্তান, ইরাক ও লিবিয়াতে তা সম্ভব হয়নি। তার কারণ, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নাকি এসব সমাজে বিরাজমান বিভাজন সেই বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে; এটাও মনে করা যায়, বৈশ্বিক রাজনীতিতে যে পরিবর্তন ঘটেছে, ক্ষমতা ভারসাম্যের ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, সে কারণে তা সম্ভব নয়। কিন্তু ফল একই—রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া শেষ বিচারে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এবং দেশের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির কাজ। বাইরের শক্তি কেবল সহায়ক হতে পারে। তারপরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা

ছাড়া গড়ে ওঠা রাষ্ট্র ভঙ্গুরই হয়। রাজনৈতিক সমস্যার কোনো সামরিক সমাধান নেই, এটাও একটি বড় শিক্ষা। তালেবানের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনায় যেতে কাবুলের সরকারের অনাগ্রহ তালেবানের জন্য শাপে বর হয়েছে। তারা শান্তি আলোচনাকে ব্যবহার করেছে বৈধতা তৈরির জন্য, ক্ষমতা তারা শক্তি দিয়েই দখল করতে চেয়েছে, তাতে তারা সফল হয়েছে।

শেষ কথা নয়

আফগানিস্তানের আগামী দিনগুলো যে ঘটনাবহুল হবে, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অনুমান করা দুঃসাধ্য নয় যে তালেবান বিজয়ী হবে। দেশটির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। কিন্তু তা ১৯৯৬ সালে প্রত্যাবর্তন কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। মার্কিনদের পরাজয়ই আফগানিস্তানের ইতিহাসের শেষ কথা নয়। বরং বলা যেতে পারে, এটি সূচনামাত্র।
[১৫ আগস্ট ২০২১]

তালেবানের বিজয় ও উদ্বেগের কিছু দিক

আফগানিস্তানে রাষ্ট্রক্ষমতায় তালেবানের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। সেখানকার ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে যেমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হচ্ছে, তেমনি হচ্ছে আবেগাপ্লুত আতিশয্য, ঘটছে অতিশয়োক্তি। তালেবানের সম্ভাব্য বিজয় নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহের আলোচনায় বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগও প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ এসব উদ্বেগকে ছুড়ে ফেলে দিতে চান এই বলে যে 'এই তালেবান সেই তালেবান নয়' এবং এসব উদ্বেগ তালেবানবিরোধী প্রচারণার অংশ। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা ও উদ্বেগ আমাদের মনোযোগ দাবি করে।

তালেবানের বিজয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

তালেবানের বিজয়ের পরের পরিস্থিতির একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে আফগানিস্তানের মানুষ তাদের পছন্দের রাজনৈতিক শক্তিকে বেছে নিয়েছে, তারা বিদেশি শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তালেবানের একধরনের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা এর মধ্যে আছে। এ ব্যাখ্যা একার্থে সঠিক; তালেবানের প্রতি আফগান জনগণের সমর্থনের একটি ভিত্তি অবশ্যই জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদ আফগানিস্তানের সমাজের জাতিগোষ্ঠীগত বিভেদকে অতিক্রম করতে পেরেছে কি না, সেটা স্পষ্ট নয়। তারপরও তালেবানের বিজয়ের অন্যান্য কারণও আছে (আলী রীয়াজ, 'আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় যেভাবে অনিবার্য হয়ে উঠল', প্রথম আলো অনলাইন, ১৫ আগস্ট ২০২১)।

জাতীয়তাবাদী এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয় এ কারণেও যে এতে তালেবানের রাজনৈতিক চরিত্রের প্রশ্ন অনুপস্থিত। তালেবান পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিল এবং যে শাসনব্যবস্থা তৈরি করেছিল, তার প্রকৃতি কী ছিল, সেটাও অনুপস্থিত। তালেবানের বিজয়কে 'বিদেশি শক্তির' বিরুদ্ধে 'আফগান জনগণের বিজয়' হিসেবে যাঁরা বিবেচনা করেছেন, তাঁদের যা জানা প্রয়োজন তা হচ্ছে তালেবান অবশ্যই আফগান জনগণের অংশ, কিন্তু একমাত্র তালেবানই আফগানিস্তান নয়। তালেবানের অনুসারীদের বাদ দিয়ে যেমন আফগানিস্তান নয়, তেমনি যারা তালেবানের বাইরে, তাদের বাদ দিয়েও আফগানিস্তান নয়। কেবল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকা যে অসম্ভব, তার উদাহরণ হিসেবে কাবুলে গত ২০ বছরের সরকারের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তালেবান এখন যে শক্তি প্রয়োগ করে, যুদ্ধ করেই কাবুলে উপনীত হয়েছে, সেটাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।
অন্যদিকে যাঁরা আদর্শিক বিবেচনা থেকে তালেবানের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন এবং আনন্দ প্রকাশ করছেন, তালেবানের বিজয়কে ইসলামের বিজয় বলছেন, তাঁদের অবস্থানও একইভাবে পক্ষপাতদুষ্ট। তালেবানের শাসন আর ইসলামি বিধান এক কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে, ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে তালেবানের প্রতিষ্ঠিত আমিরাতের পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইসলামের নামে করলেই যেকোনো কাজ ইসলামি বিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবেই, তা নয়।

আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ এবং তালেবানের সম্ভাব্য ভূমিকা বিষয়ে যেসব উদ্বেগ-আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে, তাকে কেবল পশ্চিমা সমালোচনা, ইসলামবিরোধিতা বা ইসলামপন্থী রাজনীতিকে ভুলভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা বলে নাকচ করা ঠিক হবে না। এসব উদ্বেগের কোনো দিক যদি ভুল বা অতিরঞ্জন হয়, তবে সেটাও চিহ্নিত করা দরকার। বিপরীত দিকে আফগানিস্তানে এবং এ অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার বিবেচনায় এ উদ্বেগগুলো বোঝা, আলোচনা করা এবং এগুলো মোকাবিলার প্রস্তুতি খুবই জরুরি। আফগানিস্তানের বাইরে যাঁরা এখন তালেবানের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, তাঁদের বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে শোনা দরকার, কেননা তালেবানের ক্ষমতাসীন হওয়ায় এ অঞ্চলে তার কী প্রভাব পড়বে, এর মধ্যেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

তিন ধরনের উদ্বেগ

তালেবানের শাসনাধীন আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগগুলোকে মোটাদাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, দেশের অভ্যন্তরে কী ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু করা হবে। দ্বিতীয়ত, আফগানিস্তান আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবে কি না। তৃতীয়ত, আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য আফগানিস্তান হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হবে কি না।

তালেবান ১৯৯৬-২০০১ সালে ক্ষমতায় থাকার সময় যে শাসনব্যবস্থা চালু করেছিল, তাতে জনগণের অংশগ্রহণের কোনো পথ ছিল না। নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকারগুলো অনুপস্থিত ছিল। বল প্রয়োগ করে কথিত আচরণবিধি বাস্তবায়িত হয়েছিল, নারীদের মৌলিক অধিকারগুলো হরণ করা হয়েছিল, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, শিক্ষাব্যবস্থাকে সীমিত করা হয়েছিল, একমাত্র ধর্মভিত্তিক শিক্ষাকেই শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। এসব পদক্ষেপকে ইসলাম এবং আফগান সমাজের বৈশিষ্ট্য—এসব অজুহাত দেখিয়ে জারি করা হয়। ইসলামের একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাকে তারা চূড়ান্ত বলে চাপিয়ে দেয়। ইসলামি চিন্তায়ও যে বৈচিত্র্য আছে, বহুমাত্রিকতা বা প্লুরালিটি আছে, তা তালেবান স্বীকার করেনি। আফগানিস্তানে তালেবান সেগুলো আবার চালু করবে না, এমন কোনো ইঙ্গিত তালেবান দেয়নি। তালেবান নেতৃত্ব এ বিষয়ে কতটা আন্তরিক বা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাদের অনুসারীরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে এ ধরনের শাসন চালাবে না, এমন নিশ্চয়তা কি আছে?

আফগানিস্তান একসময় আল-কায়েদার ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণের জায়গা হয়ে উঠেছিল। সুদান থেকে ১৯৯৬ সালের দিকে ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে পাড়ি জমান এবং তাঁর নেতৃত্বেই আল-কায়েদা যুক্তরাষ্ট্রে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের ওপরে হামলা চালিয়েছে। তালেবান যদিও যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়াকে আশ্বস্ত করেছে যে ভবিষ্যতে তারা এ ধরনের সংগঠনকে জায়গা দেবে না, কিন্তু আফগানিস্তানবিষয়ক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আল-কায়েদার সঙ্গে তালেবানের যোগাযোগ 'অটুট'। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শিক্ষক এবং আফগান রাজনীতি ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক আসিম ইউসুফজাই বিবিসিকে বলেন, 'তালেবান মুখে যতই প্রতিশ্রুতি দিক না কেন, আল-কায়েদার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এখনো অটুট এবং আফগান বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে আল-কায়েদাও তালেবানের সঙ্গে যুদ্ধ করছে' (শাকিল আনোয়ার, 'আফগানিস্তান: তালেবান অবিশ্বাস্য গতিতে দখল করছে পুরো দেশ, তাদের শক্তির উৎস কী', বিবিসি, ১৩ আগস্ট ২০২১)।

রাষ্ট্রীয় মদদ ছাড়াও এ ধরনের সংগঠন বিকশিত হতে পারে। তালেবান যদি সারা দেশে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সুযোগে ইসলামিক স্টেট বা আল-কায়েদা যে তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই; অন্যত্রও তা-ই হয়েছে। এ ধরনের সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সক্ষমতা তালেবানের থাকবে কি না, না থাকলে এ ধরনের সংগঠনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক

কোনো উদ্যোগে সহযোগিতা করবে কি না, সেটা মোটেই স্পষ্ট নয়। অনুমান করা হচ্ছে, আগের মতোই তারা এ ধরনের কাজে সহযোগিতা করতে অনীহ হবে। ফলে তালেবানের সমর্থন না থাকলেও আফগানিস্তান আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য হতে পারে। তালেবানের ভেতরে তুলনামূলকভাবে যাঁরা কট্টরপন্থী, তাঁরা যদি এ প্রতিশ্রুতি রাখতে রাজি না হন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। এগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় উদ্বেগের বিষয়। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ তালেবান শাসনকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে সরকারের বিরোধীদের ওপরে নিপীড়ন চালাতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা সহিংস উগ্রবাদী সংগঠনের উপস্থিতিকে তাঁদের ক্ষমতা সংহত করার কাজে ব্যবহার করে আসছেন, নিপীড়নের নতুন নতুন ব্যবস্থাকে বৈধতা দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে এর ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা কম।

তৃতীয় উদ্বেগের দিক হচ্ছে আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন তালেবানের আদর্শিক প্রভাব দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ায় কতটা পড়বে, কীভাবে পড়বে। এ কথা কেউ ভুলে যাননি যে সোভিয়েতবিরোধী মুজাহিদদের সমর্থনেই গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানভিত্তিক সহিংস উগ্রবাদী সংগঠন হরকাতুল মুজাহিদীন (হুজি)। ১৯৮৮ সালে এ নামে সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হলেও সাংগঠনিকভাবে এর সূচনা আগেই। ১৯৯২ সালের মধ্যেই এর বিস্তার ঘটে, হয়ে ওঠে আঞ্চলিক সন্ত্রাসী সংগঠন। বাংলাদেশে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল—কাবুলের পতনের পর। তালেবানের বিজয় এ আদর্শে বিশ্বাসীদের উজ্জীবিত করবে। গত ২০ বছরে তালেবান ক্ষমতায় না থেকেই এ আদর্শের পক্ষে সদস্য সংগ্রহ করতে পেরেছে, এখন সাফল্যের কারণে আকর্ষণ বেশি হবে। পাকিস্তানের তালেবান, যারা এত দিন আফগানিস্তানের তালেবানকে সাহায্য করেছে, তারা এখন আরও বেশি শক্তিশালী হবে, এত দিনের সহযোগিতার প্রতিদান চাইবে।

এর পাশাপাশি আরেকটি উদ্বেগের কথা বলা দরকার, যা আন্তর্জাতিক কুশীলবেরা বলছেন না। তা হলো দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ একে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে সরকারের বিরোধীদের ওপরে নিপীড়ন চালাতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা সহিংস উগ্রবাদী সংগঠনের উপস্থিতিকে তাঁদের ক্ষমতা সংহত করার কাজে ব্যবহার করে আসছেন, নিপীড়নের নতুন নতুন ব্যবস্থাকে বৈধতা দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে এর ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা কম। আফগানিস্তানে তালেবান কী করছে, সেদিকে যেমন নজর থাকতে হবে, তেমনি তাদের আদর্শের অনুসারীরা দেশে দেশে কী করছে এবং তালেবানের অজুহাত দেখিয়ে সেসব দেশের সরকারগুলো কী করছে, সেদিকেও নজর রাখা জরুরি।

অনিশ্চিত আগামী

আফগানিস্তানে তালেবানের বিজয়কে কেন্দ্র করে এখন পর্যন্ত বড় আকারের সংঘাত ঘটেনি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আগামী দিনগুলো নিরাপদে যাবে। শুধু তা-ই নয়, আগামীর পথরেখাও অস্পষ্ট। আফগানিস্তানের ইতিহাসে এ রকম অনিশ্চিত যাত্রা এই প্রথম নয়, কিন্তু তা না আফগানিস্তানের জনগণকে, না আন্তর্জাতিক সমাজকে কোনো রকম স্বস্তি দিতে পারে। তালেবানের আচরণই কেবল বলতে পারে আফগানিস্তান কোন পথে এগোবে।

[১৭ আগস্ট ২০২১]